▲ বিরোধিতা করার অধিকার ও গণতন্ত্র

গণতন্ত্র বলতে কেবল জনগণের শাসন নয়, জনগণের জন্যও বটে। কিন্তু কী পরিমাণে এই শাসন জনগণের কল্যাণ করছে অথবা সরকারের কোনো নীতি আদৌ জনগণের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম কিনা তা জানার ও সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার জনগণের অধিকার আছে এবং সেই অধিকার যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় তা হলে সরকারের নীতি ও কর্মসূচির ব্যাপক বিশ্লেষণ অবশ্যই প্রয়োজন। যে শাসন ব্যবস্থায় এর সুযোগ আছে তাকেই আমরা গণতন্ত্র বলব। গণতন্ত্র হল একটিমাত্র ভাব, চিন্তা ও নীতির আবাসস্থল নয়। বহু পথ ও মতের মিলনস্থল হল গণতন্ত্র। বার্কার বলেছেন : The core of democracy is choice and not something chosen. Democracy is incompatible with any form of one idea state, because its essence is hospitality to a plurality of ideas (p 207). তাই যদি হয় সরকারের নীতি, আইন এবং কর্মসূচিকে চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়া গণতন্ত্রের পক্ষে কোনো প্রকারে সম্ভব নয়। যে-কোনো আইন বা কর্মসূচির বিরোধিতা করা অ-বাঞ্ছনীয় বা অনভিপ্রেত নয়। কারণ এ কাজ গণতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত। বিরোধিতার অস্তিত্ব ও তার বাস্তবায়নের মধ্যে বিস্তর ফারাক নানা কারণে থেকে যায়। স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকার মুখে স্বীকার করে যে তার নীতি, আইন ও কর্মসূচির বিরোধিতা জনগণ করতে পারবে। কিন্তু এর জন্য যে অনুকূল পরিবেশ থাকা প্রয়োজন তা স্বৈরতন্ত্র স্বীকার করে না বা সৃষ্টি করতে চায় না। তাই স্বৈরতন্ত্রে বিরোধিতা করার অধিকার নেই অথবা কাগজে কলমে থাকলেও জনগণ তাকে কাজে পরিণত করে তুলতে পারে না। তাই আমরা বলি যে গণতন্ত্রকে বিরোধিতা করার অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না এবং

গণতন্ত্র বলতে আমরা কী বুঝি?

কেউ যদি এ পথে অগ্রসর হয়, তা হলে সেই ব্যবস্থা কেবল সাইনবোর্ডধারী গণতন্ত্র হয়ে থাকবে। আবার গণতন্ত্র মানে সহিষ্ণুতা, বিরোধী মত শোনার এবং তার অর্থ গ্রহণ করার মতো সহিষ্ণুতা শাসকগোষ্ঠীর থাকবে এবং দাবি করা হয় গণতন্ত্রে এর অস্তিত্ব আছে।

অনেক দিন আগে ল্যাস্কি বলেছিলেন যে সরকার তার কাজের সমালোচনা অনেক বেশি শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে যা প্রশংসা থেকে সম্ভব নয়। এই মন্তব্য সর্বাংশে সত্য। কারণ যে-কোনো সরকারের অনেক রকম ত্রুটিবিচ্যুতি থাকতেই পারে এবং সেগুলি কেবল সমালোচনা থেকেই বেরিয়ে আসে। আর সমালোচনা হলে সরকার তার ত্রুটিগুলি যে কেবল জানতে পারে তা নয় সেগুলি সংশোধন করার সুযোগও সরকার পায়। **প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার** নানাভাবে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে যাতে করে জনসাধারণ সরকারের কাজের সমালোচনা করার অবকাশ পায়। তার জন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে খোলামেলা পরিবেশ গড়ে তোলার কাজে গণতান্ত্রিক সরকার উদ্যোগ নেয়। জনমত গঠনের মাধ্যমগুলিকে বিকশিত হবার ও তৎপরতা দেখাবার সুযোগ দেয়, রাজনীতিক দল ও নানাপ্রকার সংগঠনের ওপর অহেতুক নিষেধ আরোপ করা থেকে বিরত থাকে। সর্বোপরি প্রচারমাধ্যমগুলি স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায়। এই সমস্ত ব্যবস্থা বিরোধিতা করার অধিকারকে ফলপ্রসূ করে তোলে। প্রচারমাধ্যম (বৈদ্যুতিন ও মুদ্রণ মাধ্যম) সরকারের যে-কোনো নীতি বা কাজের দোষত্রুটি জনগণের সামনে উপস্থাপিত করে এবং এদের জনগণের ওপর অপরিসীম প্রভাব লক্ষ করা যায়। সব কিছু মিলে একটি খোলা আবহাওয়া গণতন্ত্রে বইতে থাকে। সমালোচনার মধ্যে সত্যতা থাকলে বা সমালোচনা গঠনমূলক হলে সরকার সেই অনুযায়ী কাজ করে। বহুত্ববাদী ভাবনা ও চেতনার ত্রুটি হল একটি উজ্জ্বলতর ও শুভময় দিক যা গণতন্ত্রের পুষ্টিসাধনে তাৎপর্যবাহী ভূমিকা পালন করে। গণতন্ত্রে সংসদের অভ্যন্তরেও বিরোধী দল বিরোধিতা করার অধিকারকে সুন্দরভাবে কার্যকর করে। বিরোধী দলের অন্যতম কাজ হল সরকারের বিরোধিতা করা (অবশ্য গঠনমূলক উপায়ে)। ব্রিটেনের সংসদীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয় যে মহানুভব রানি তাঁর কাজের সমালোচনা করার জন্য বিরোধী দল ও তার নেতাকে বিশেষভাবে পুষে রেখেছেন। সেখানে বিরোধী দলের নেতা বিশেষ সম্মানের অধিকারী। বিরোধিতা করার অধিকার এইভাবে গণতন্ত্রে বিশেষ মর্যাদায় আসীন।

গণতন্ত্রে কীভাবে এর বিকাশ ঘটে?

সমস্ত প্রকার শাসন ব্যবস্থায় প্রশাসন চালাবার জন্য আইন রচিত হয়। কিন্তু আইন রচনা বড়ো কথা নয়, আইনের বাস্তবায়ন বা আইনের প্রতি জনগণের আনুগত্য হল সবচেয়ে বড়ো কথা। প্লেটো অথবা রুশো প্রকাশ্য সমাবেশে আইন প্রণয়নের কথা ভেবেছিলেন। তবে আজকালকার দিনে এর সুযোগ নেই। আইন রচনার জন্য আছে আইনসভা। আইন মেনে চলা ও আইনের বিরোধিতা করা এবং দুটি বিষয় গণতন্ত্রের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। আইনের প্রতি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বাধ্যতা না থাকলে সেই আইন অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই বাধ্যতাকে সুনিশ্চিত করার জন্য একে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে করে জনগণের 'কার্যকর চাহিদার' (effective demand) তৃপ্তিসাধন ঘটে। আইন রচিত হবে বিশেষ প্রয়োজন মেটানোর জন্য এবং সেকাজ আইন সাফল্যের সঙ্গে করতে সক্ষম হলে জনগণ (অর্থাৎ যাদের জন্য আইন রচিত হয়েছে) সেই আইন মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে **আইনের প্রতি বাধ্যতা প্রদর্শন শর্তহীন নয় শর্তাধীন**। আর এখানেই গণতন্ত্রের সঙ্গে স্বৈরতন্ত্রের ফারাক প্রকট হয়ে পড়ে। প্রয়োজন মিটুক বা না মিটুক স্বৈরতন্ত্র বলে যে আইন মেনে চলা বাধ্যতামূলক। স্বৈরতন্ত্রে বিরোধিতার স্থান নেই। আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়া গণতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্রে একইরকম হতে পারে। কিন্তু যাদের জন্য আইন তারা কোন্ দৃষ্টিতে আইন দেখছে তা বিচার্য বিষয়। স্বৈরতন্ত্র আইনের গুণাগুণ বিচারের কোন সুযোগ রাখেনি এবং সেই কারণে এই জাতীয় শাসন ব্যবস্থায় বিরোধিতা করা অধিকারও স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হয় নি। ল্যাস্কি সহ বহু গণতন্ত্র প্রেমিক এই বিষয়টির ওপর পর্যাপ্ত আলোকপাত করেছেন। আইন জনগণের কার্যকর চাহিদাপূরণে ব্যর্থ হলে জনগণের অধিকার থাকবে তার বিরোধিতা করার। এই মৌলিক নীতির ওপর গণতন্ত্র অনেকখানি দাঁড়িয়ে আছে। জনস্বার্থ বিরোধী বা অনুর্বর আইন জনগণ মেনে চলতে বাধ্য হলে গণতন্ত্র অর্থহীন হয়ে পড়ে।

আইন, গণতন্ত্র ও বিরোধিতা করার অধিকার

ভাববাদীরা বিরোধিতা করার অধিকারকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করার ফলে এই অধিকারটি কার্যক্ষেত্রে অনেকখানি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে যাকে অনেকে অনভিপ্রেত বলে মনে করেন। কারণ তাঁরা মনে করেন যে রাষ্ট্র হল সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ইত্যাদির বহিঃপ্রকাশ। এগুলি রাষ্ট্রের মধ্যে চরম আকারে প্রকটিত এবং ব্যক্তির

আদর্শ, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি রাষ্ট্রের এগুলি থেকে আলাদা নয় এবং সেই কারণে ব্যক্তি রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্র প্রণীত আইনের বিরোধিতা করতে পারে না। ভাববাদীরা আরও মনে করতেন যে রাষ্ট্র যে সমস্ত আইন প্রণয়ন করে যেগুলির মধ্যে অবিবেচনার স্থান নেই বা থাকলেও তা নগণ্য। আরও অন্যান্য যুক্তিতে ভাববাদীরা রাষ্ট্র এবং তার আইনের বিরোধিতা করার অধিকার স্বীকার করতে চাননি। গ্রিন উদারনীতিবাদে বিশ্বাসী হলেও ভাববাদী ছিলেন।

গ্রিন বর্ণিত ভাববাদে বিরোধিতা করার অধিকার

তিনি রুশোর অভিন্ন কল্যাণ ধারণাটিকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় একে নানাভাবে প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেন যে-কোনো রাষ্ট্র যদি এমন আইন প্রণয়ন করে যা সমগ্র সমাজের অভিন্ন কল্যাণ বা স্বার্থের পরিপন্থী তা হলে নাগরিক সেই আইন অমান্য করতে পারবে। কিন্তু এই বিরোধিতার গণ্ডিকে গ্রিন নানাভাবে সঙ্কুচিত করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন যে সমাজের নানা মানুষের চাহিদার মধ্যে একটি বোঝাপড়া বা ভারসাম্য থাকে এবং এর ফলে সকলের চাহিদার তৃপ্তিসাধন ঘটে। সুতরাং কারোর কোনো অভিযোগ থাকার কথা নয়। তাছাড়া সমাজ বা রাষ্ট্র সব সময় চেষ্টা করে অভিন্ন কল্যাণের লক্ষ্যে উপস্থিত হতে। তিনি বলেছেন : A right against society...a right to act without reference to the needs or good of society is an impossibility (p148). তিনি আরও বলেছেন (পৃ:১১১) যে গণতান্ত্রিক সরকার যেভাবে গঠিত হয় ও যে প্রক্রিয়ায় কাজ করে তাতে জনস্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপের স্থান আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং এই জাতীয় সরকারের আইন অমান্য করার বা রাষ্ট্রের বিরোধিতা করার অর্থ হল অভিন্ন কল্যাণের বিরোধিতা করা। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন : It is thus the social duty of the individual to conform, he can have no right against his social duty. সামাজিক কর্তব্য হল আইনের প্রতি আনুগত্য দেখানো।

জেরেমি বেন্থাম, জেমস মিল ও জন স্টুয়ার্ট মিল যেভাবে উপযোগবাদ বা হিতবাদ তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেছেন ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমিত করে গেছেন তাতে আমরা বিরোধিতা করার অধিকারটির একটি স্পষ্ট চিত্র পাই। এঁরা তিনজন উপযোগবাদ তত্ত্বটি শিল্প বিপ্লব, ও শিল্প বিপ্লবজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে গুরুত্ব প্রদানের প্রেক্ষাপটে এই তত্ত্বটি প্রচার করেছিলেন। শিল্প বিপ্লবের পরে মূলত পুঁজিপতিরা সমাজে নানাভাবে প্রাধান্য স্থাপন করত।

হিতবাদী তত্ত্বে বিরোধিতা করার অধিকার

কিন্তু এঁরা লক্ষ করলেন যে নতুন গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। রাজনীতিক কাজকর্মে তারাও অংশগ্রহণে ইচ্ছুক এবং তাদের অভাব অভিযোগ, প্রয়োজন, অপ্রয়োজন উপেক্ষণীয় নয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণি সহ সাধারণ মানুষকে রাজনীতির সামনের সারিতে আনার জন্য এঁরা ঘোষণা করলেন যে সরকার এমন আইন প্রণয়ন করবে না যা জনগণের আনন্দকে বিঘ্নিত করে যন্ত্রণার পরিধি বাড়িয়ে তুলে এবং আইন তা করছে কিনা তা বিচার করার ভার তাদের ওপর যাদের জন্য আইন প্রণীত হয়েছে। অন্য কেউ তার বিচার করতে পারবে না। এইভাবে উপযোগবাদ রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্রপ্রণীত আইনের বিরোধিতা করার অধিকার স্বীকার করে নেয় এবং শুধু তাই নয় এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে এঁরা জোর সওয়াল করে গেছেন। বিরোধিতা করার অধিকারের ওপর হিতবাদীরা এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে এই অধিকারটি উপযোগবাদ তত্ত্বে বিশেষ স্থানের অধিকারী এবং এর থেকেই জন্ম নিয়েছে সীমিত রাষ্ট্রের তত্ত্বটি। অর্থাৎ রাষ্ট্রের যে-কোনো কাজ, আইন, কর্মসূচি জনগণের বিচার, বিশ্লেষণ ও অনুমোদনের বাইরে অবস্থান করতে পারে না। গ্রিন যেমন মনে করতেন যে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এমনভাবে তৈরি হয় যে নানা লোকের নানা চাহিদার মধ্যে একটি বোঝাপড়া গড়ে ওঠে এবং তার মধ্যে ব্যাপক আকারের বিরোধিতার অবকাশ প্রায় নেই বললেই চলে আর যদি বিরোধিতা করতেই হয়, তাহলে তা সংবিধান, আইন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে করতে হবে। ভাববাদ ও হিতবাদের যে বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল এই দুই মতবাদে রাষ্ট্র ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের কোনো অবকাশ নেই।

কোনো অধিকার যেখানে চরম নয় বিরোধিতার করার অধিকারকে চরম বলে ঘোষণা করতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হবে। তা সত্ত্বেও বিষয়টি সংক্ষিপ্ত আলোচনার দাবি রাখে। আমরা মনে করি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নাগরিকের প্রয়োজন ও দাবি দাওয়ার প্রতি সরকার সহানুভূতি সম্পন্ন হলে এবং তাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকলে ছোটোখাট ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য সরকারের সমালোচনা করা যেতেই পারে এবং সরকারের কোনো কোনো কাজ, নীতি ও কর্মসূচির প্রতিবাদ বা বিরোধিতা জনসাধারণ অবশ্যই করতে পারবে। কারণ সরকারের সমস্ত কাজ, আইন ও নীতির প্রতি জনসাধারণ নিঃশর্ত সমর্থন জানাবে এবং বিকল্প মত, পথ, চিন্তার অগ্রদূত হিসেবে জনগণ কোনো ভূমিকা পালন করবে না তা

বিরোধিতা করার অধিকার কী চরম?

হতে পারে না। তদুপরি যে-কোনো বিষয় বা চিন্তার বিরুদ্ধে ভিন্ন মত থাকতেই পারে। এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিটি স্বীকার করে নিলে আমাদের বলতে হয় যে বিরোধিতার অধিকার মৌলিক এবং যে-কোনো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে তা স্বীকার করে নিতে হবে। কিন্তু সমস্ত অবস্থায় ও পরিস্থিতিতে বিরোধিতা করার অধিকার মেনে নেওয়া চলে না। বিরোধিতা করা ও বাধ্যতা দেখানোর মধ্যে একটি ভারসাম্য থাকা একান্ত প্রয়োজন। *বিরোধিতা করার জন্য বিরোধিতা করাকে মেনে নেওয়া যায় না।* যে-কোনো বিষয়ে জনগণ রাজনীতিক কর্তৃপক্ষের বিরোধিতায় নামলে রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নষ্ট হতে বাধ্য। সমাজের দ্রুত বিকাশ ও সুস্থ সমাজ জীবনের জন্য রাজনীতিক ও অন্যান্য স্থিতিশীলতা অপরিহার্য। সেই কারণে বিরোধিতা করার অধিকারকে চরম বলে কেউ মেনে নিতে রাজি নয়। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বিরোধিতা করা দরকার এবং এই বিরোধিতার বিস্তৃতি কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হবে তা জনগণের সচেতনতা, রাজনীতিক দলগুলির হস্তক্ষেপ, সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি সব কিছুর ওপর নির্ভর করে।

মার্কসবাদ আলোচনা করলে দেখা যায় যে বুর্জোয়া চিন্তাবিদরা বিরোধিতা করার অধিকারকে যে দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন মার্কসবাদীরা তা করেননি। মার্কসবাদ মনে করে যে সমাজের লাগামহীন পোষণ, অত্যাচার, আর্থ-ব্যবস্থায় তীব্র বৈষম্য ইত্যাদির জন্য পুঁজিবাদ স্থায়ী এবং এর পরিসমাপ্তি না ঘটালে শ্রমিক শ্রেণি ও সাধারণ মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়। সুতরাং শোষণ ও পীড়নের প্রতীক পুঁজিবাদের প্রতি কোনোপ্রকার আনুগত্যের প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর। বরং সমস্ত রকম উপায়ে এর বিরোধিতা করা হবে শ্রমিক শ্রেণির একমাত্র লক্ষ্য। এই বিরোধিতা করার অধিকারকে মার্কসবাদীরা চরম বলে মনে করেন। কারণ পুঁজিবাদকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত শ্রমিকরা লাগাতার আন্দোলন (বা বিরোধিতা) করে যাবে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিলোপসাধন করে তার জায়গায় শ্রেণিহীন, শোষণহীন সমাজব্যবস্থা স্থাপিত হলে এই বিরোধিতার অবসান ঘটবে। মার্কসবাদে আমরা বিরোধিতা করার দুটি স্পষ্ট দিক পাচ্ছি। একটি হল পুঁজিবাদের বিরোধিতা করে (এবং বিরোধিতা করার অধিকার আছে।) তাকে ধ্বংস করে ফেলা। সুতরাং এ জাতীয় বিরোধিতা করার অধিকার চরম। আবার পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জায়গায় যে সমাজ ব্যবস্থা স্থাপিত হবে তার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করা। অর্থাৎ তার প্রতি সর্বাধিক বাধ্যতা প্রদর্শন ও তার স্থিতিশীলতার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা। নতুন সমাজ ব্যবস্থার আদৌ বিরোধিতা না করা। পুঁজিবাদের প্রতি আনুগত্য না দেখানোকে মার্কসবাদ নৈতিক কাজ বলে মনে করে। কারণ এই পুঁজিবাদ শোষণ ও অত্যাচার কায়েম করতে চায়। আবার সমাজবাদের বিরুদ্ধাচরণ না করাও নৈতিক কর্তব্য ও দায়িত্ব। কারণ কেবল সমাজবাদই শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের সার্বিক মুক্তি সুনিশ্চিত করতে পারে। এমনকি সমাজবাদের ওপর যাবতীয় সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করাও হবে শ্রমিক শ্রেণির অন্যতম লক্ষ্য। এইভাবে মার্কসবাদ রাজনীতিক আনুগত্য ও বিরুদ্ধাচরণের অধিকারকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে।

মার্কসীয় ধারণা